উপমহাদেশের দৃশ্যপট পাল্টানো যুদ্ধ

ফিরে দেখা ১৯৬৫ | ইশফাক ইলাহী চৌধুরী

অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমডোর;
নিরাপত্তা বিশ্লেষক

এই মাসে পূর্ণ হতে যাচ্ছে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর। সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে সূচিত ১৭ দিনের ওই লড়াই সমাপ্ত হয়েছিল ২২ সেপ্টেম্বর এক যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই '৬৫ সালের যুদ্ধের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উদযাপিত হচ্ছে। পাকিস্তানে সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখ পালিত হয়ে থাকে 'ডিফেন্স অব পাকিস্তান ডে' হিসেবে এবং পরদিন ৭ সেপ্টেম্বর হচ্ছে 'পাকিস্তান এয়ারফোর্স ডে'। ঘটনাক্রমে আজকের বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ '৬৫ সালের যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বলতে গেলে আজকে ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্রে যে বদল, তার নেপথ্যে বড় ভূমিকা রেখেছিল ১৭ দিনের ওই লড়াই।

১৯৬২ সালের ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের পর থেকেই পাকিস্তানের শাসক মহল বুঝতে পেরেছিল, উপমহাদেশের সামরিক ভারসাম্য ক্রমে ভারতের দিকে ঝুঁকছে। ওই যুদ্ধের পর থেকেই পশ্চিমা শক্তিগুলো বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করতে ব্যাপক সামরিক সহায়তা দিয়ে আসছিল। অবশ্য উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ভারতের প্রধান উৎস ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন; চীন-ভারত যুদ্ধের পর পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছ থেকে পাওয়া সামরিক সহায়তা ছিল তার অতিরিক্ত।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের ওপর সামরিক চাপ প্রয়োগ করার, যাতে দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলে থাকা কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে নয়াদিল্লি সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল এই ধারণার ভিত্তিতে যে, কাশ্মীর এলাকায় সীমিত আগ্রাসন ভারতের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের দিকে মোড় নেবে না। ওই পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছিল পাকিস্তানের সেনা সদর দপ্তরে কঠোর গোপনীয়তার সঙ্গে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও তার তরুণ-তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাড়া পাকিস্তানের বেসামরিক মহলের প্রায় কেউই বলতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ জানত না। এমনকি পাকিস্তানের বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী কমান্ডও এই পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছে অনেক পরে।

১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথমদিকে পাকিস্তান ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে এক গোপন অভিযান শুরু করে। এর সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন জিব্রাল্টার'। এর লক্ষ্য ছিল ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বাড়ানো। পাকিস্তান এজন্য 'সাদা-ই-কাশ্মীর' নামে একটি রেডিও স্টেশনও চালু করে। পাকিস্তানের নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছিল, এর মাধ্যমে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠবে; কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের কিছু ঘটেনি। বরং অনুপ্রবেশকারীদের অধিকাংশই আটক হয়েছিল বা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছিল। আগস্ট মাসের শেষ নাগাদ 'অপারেশন জিব্রাল্টার' ফিকে হতে হতে মিলিয়ে গিয়েছিল। আর তথাকথিত মুজাহিদদের সামান্য যে কয়জন টিকে ছিল, তারা জীবন বাঁচাতে পাকিস্তানে ফিরে গিয়েছিল।

অপারেশন জিব্রাল্টার ব্যর্থ হলেও পাকিস্তান তাদের পরিকল্পনা থেকে সরে আসেনি। ওই পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন (১৯৬৫ সাল) পাকিস্তান শুরু করে 'অপারেশন গ্র্যান্ড স্লাম'। এর আওতায় পাকিস্তানি নিয়মিত সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতি রেখা বা সিএফএল (সিজফায়ার লাইন) অতিক্রম করে এবং জম্মুর দিকে অগ্রসর হয়। পরবর্তী কয়েক দিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে এবং জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলার হুমকি তৈরি করে। ওই দিন থেকেই যুদ্ধে যোগ দেয় দুই দেশের বিমানবাহিনীও। প্রথম মুখোমুখি হওয়ার সময়ই পাকিস্তান এয়ারফোর্সের (পিএএফ) ফাইটারগুলো ভারতীয় বিমানবাহিনীর (আইএএফ) দুটি ভ্যাম্পেয়ার ফাইটারকে ভূপাতিত করে ফেলে।

২ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, পাকিস্তান যদি তাদের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধবিরতি রেখার এপার থেকে প্রত্যাহার না করে, ভারত তাহলে 'নিজের পছন্দমতো সময় ও স্থান বেছে নিয়ে' হামলা চালাবে। বলা বাহুল্য, পাকিস্তান তাতে কর্ণপাত করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জবাব আসে ৫-৬ সেপ্টেম্বর রাতে শিয়ালকোট ও লাহোরে বিমান হামলার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ এই দুই শহরে হামলার পাশাপাশি ভারতীয় বাহিনী লাহোর ও ইসলামাবাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেল যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করে ফেলার মতো হুমকি সৃষ্টি করে।

এই সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের (ইবিআর) প্রথম ব্যাটালিয়নকে মোতায়েন করা হয় লাহোর শহর ও বামবাওয়ালি-রাভি-বেদাইন ক্যানেল (বিআরবি ক্যানেল) প্রতিরক্ষার জন্য। ভারতীয় বাহিনীর দফায় দফায় হামলা সত্ত্বেও এই রেজিমেন্ট তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ টিকিয়ে রেখেছিল। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তারা কেবল সুরক্ষাই দেয়নি, পাল্টা জবাব দিয়ে হামলাকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতেও সক্ষম হয়েছিল। যুদ্ধের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সব রেজিমেন্টের মধ্যে সাহসিকতার জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খেতাব ও পদক পেয়েছিল প্রথম ইবিআর। এই রেজিমেন্ট পেয়েছিল তিনটি 'সিতারা-ই-জুরাত (বাংলাদেশের বীরবিক্রম সমতুল্য), আটটি 'তমঘা-ই-জুরাত' (বাংলাদেশের বীরপ্রতীক সমতুল্য) এবং আরও বেশ কিছু পদক ও প্রশংসাপত্র। ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আবির্ভূত হয়েছিল লাহোর শহরের রক্ষাকর্তা হিসেবে। এই রেজিমেন্টের ধ্বংস করা একটি ভারতীয় ট্যাঙ্ক এখনও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে প্রদর্শনীর জন্য রয়েছে। '৬৫ সালের যুদ্ধের আকাশপথের লড়াইয়ে পাকিস্তান এয়ারফোর্স (পিএএফ) পাইলট ও বিমানের গুণগত মানের দিক থেকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর (আইএএফ) তুলনায় বেশ খানিকটা এগিয়ে ছিল। যদিও ভারতের বিমানবাহিনী সংখ্যাগত দিক থেকে বৃহত্তর ছিল, শেষ পর্যন্ত গুণগতভাবে এগিয়ে থাকার সুবিধা পেয়েছিল পাকিস্তান। ওই সময় ভারত পূর্ব পাকিস্তানে কোনো স্থল হামলা চালায়নি। তবে ৬ সেপ্টেম্বর ভারতীয় বিমানবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড কুর্মিটোলা ও লালমনিরহাটের অব্যবহৃত বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রামের বেসামরিক বিমানবন্দরে দফায় দফায় হামলা চালায়। তেজগাঁওয়ের সামরিক বিমানঘাঁটিটি যদিও হামলার বাইরেই রয়ে যায়। এ ধরনের নিষ্ফল হামলা ছিল ভারতীয় বিমানবাহিনীর গোয়েন্দা ও সামরিক অপারেশনের গুরুতর ব্যর্থতা।

এর পাল্টা জবাব হিসেবে তেজগাঁও ঘাটি থেকে পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতীয় বিমানবাহিনীর কালাইকুন্ডা ঘাঁটিতে হামলা চালায় এবং সেখানে মজুদ থাকা বেশ কিছু ক্যানবেরা বোমারু বিমান ধ্বংস করে। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বাঙালি পাইলটরা এ সময় ব্যতিক্রমী পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও অসম সাহস দেখাতে সক্ষম হয়। উইং কমান্ডার তোয়াব, স্কোয়াড্রন লিডার আলাউদ্দিন (মরণোত্তর), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সাইফুল আজম ও ফ্লাইং অফিসার হাসান সিরাত-ই-জুরাত খেতাব লাভ করেন। লিডিং এয়ারক্রাফটসম্যান আনোয়ার হোসাইন পান তমঘা-ই-জুরাত (মরণোত্তর)। স্কোয়াড্রন লিডার এম কে বাশার, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় সেক্টর কমান্ডার হয়েছিলেন এবং পরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন, তিনি লাভ করেন 'তমঘা-ই-বাসালাত'। এই উচ্চ সামরিক খেতাব তাঁকে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সংখ্যক বোমারু বিমান পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়েছিল।

> ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের আগে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক মহলে সাধারণ ধারণা ছিল, বাঙালি হচ্ছে 'নন-মার্শাল জাতি' বা যুদ্ধ করতে জানে না। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে বাঙালির বীরত্ব তাদের থমকে দিয়েছিল। আর ১৯৭১ সালে বাঙালির কাছে হেরে গিয়ে বাকি জীবন তাদের ভ্রান্ত ধারণার জন্য নিষ্ফলা আফসোস করতে হয়েছে। '৬৫ সালের যুদ্ধের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তিতে সেই বাঙালি বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি

যুদ্ধের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর গোলাবারুদ ও যন্ত্রাংশের মজুদ ফুরিয়ে আসতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র যদিও যুদ্ধরত দুই পক্ষের ওপরই অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, এতে পাকিস্তানি পক্ষই বেশি বিপাকে পড়ে। কারণ তাদের প্রায় সব অস্ত্রশস্ত্রেরই উৎস ছিল যুক্তরাষ্ট্র। এই প্রেক্ষাপটে একটি যুদ্ধবিরতির জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া পাকিস্তানের পক্ষে আর কোনো উপায় ছিল না। ১৯৬৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ওই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এর পর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিনের মধ্যস্থতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে টানা কয়েকদিন আলোচনার পর 'তাসখন্দ ঘোষণা' নামে একটি শান্তিচুক্তি হয়। ১৯৬৬ সালের ৪ জানুয়ারি তাসখন্দে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃত্ব এতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে বলা হয়, উভয় দেশ তাদের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় বন্দিবিনিময় হবে।

'৬৫ সালের যুদ্ধে যদিও স্পষ্ট কোনো বিজয়ী ও বিজেতা ছিল না; কিন্তু কৌশলগত দিক থেকে পাকিস্তান বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ওই যুদ্ধের যে মূল লক্ষ্য, ভারতকে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসানো, সেটা তো ভেস্তে যায়ই; ভারত বরং কাশ্মীরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়। উপরন্তু কোনো লাভ ছাড়াই সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন। যুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক খাতে পাকিস্তান খুবই নাজুক অবস্থায় পতিত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬৫-৭০) কার্যত কাগজের মোড়কে পরিণত হয়।

অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ সামলানোর জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যুদ্ধের শুরুতেই জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং প্রশাসনিক ও বিচারিক সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। অনেক বিরোধীদলীয় নেতাকে ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের আওতায় কারারুদ্ধ করা হয়। এ ছাড়াও আইয়ুব খান 'শত্রু সম্পত্তি আইন-১৯৬৫' জারি করেন। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী তাদের সম্পত্তির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হন এবং ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরও পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে অব্যাহত থাকা ভারতের রেল ও নৌ যোগাযোগ হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৬৫ সালের ওই যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এখানে কেবল একটি মাত্র পদাতিক ডিভিশন এবং এক স্কোয়াড্রন ফাইটার বিমান ছিল। আর কার্যত কোনো নৌ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। বস্তুত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রতিরক্ষাবিহীন। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে গভীর হতাশার জন্ম হয়। যার ফলে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের পক্ষে যে ছয় দফা উত্থাপন করেন, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালি প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর দাবি করেন। দাবিগুলোর মধ্যে আরও ছিল নৌবাহিনীর সদর দপ্তর চট্টগ্রামে স্থানান্তর এবং এখানে একটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বা অস্ত্র ও গোলাবারুদ কারখানা স্থাপন। পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে অবিশ্বাস্য দাবিটি ছিল– পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য আলাদা একটি প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন। পাকিস্তানী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই দাবিগুলোকে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখেন এবং আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন। পরবর্তী ইতিহাস সবারই জানা– এই নির্যাতন-নিপীড়ন এবং বঙ্গবন্ধুকে আটকের ফলে পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয় এবং এর জের ধরে আইয়ুব খানের পতন ঘটে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা যে আত্মত্যাগ করেছিলেন ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা এখন বহুলাংশে বিস্মৃতপ্রায়। অবশ্য ওই যুদ্ধের অনেক বাঙালি যোদ্ধাই একই বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বাক্ষর রেখেছিলেন মাত্র ছয় বছর পরে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। তখন তাদের শত্রু ভারত নয়; পাকিস্তান। ভারত বরং আবির্ভূত হয়েছিল মিত্রশক্তি হিসেবে। বাঙালি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর এই বীরত্বগাথা নতুন প্রজন্মের অনেকেরই জানা নেই। অনেকেরই জানা নেই যে, বাংলাদেশের কেবল নয়; উপমহাদেশে আজকে যে মানচিত্র দেখি, তার দৃশ্যপট রচনা করেছিল '৬৫ সালের যুদ্ধ।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের আগে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক মহলে সাধারণ ধারণা ছিল, বাঙালি হচ্ছে 'নন-মার্শাল জাতি' বা যুদ্ধ করতে জানে না। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে বাঙালির বীরত্ব তাদের থমকে দিয়েছিল। আর ১৯৭১ সালে বাঙালির কাছে হেরে গিয়ে বাকি জীবন তাদের ভ্রান্ত ধারণার জন্য নিষ্ফলা আফসোস করতে হয়েছে। '৬৫ সালের যুদ্ধের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তিতে সেই বাঙালি বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।